ক্রিমিনোলোজি
বিজয়ের বর্ণ-ধ্বনি
২০২৫

পূর্ণ মানচিত্র, অর্ধেক ঘর

নুশরাত জাহান তনিমা

1st

আমাদের বাড়িতে যুদ্ধটা প্রথম হানা দিয়েছিল কোনো গুলির শব্দে নয় বরং দাদুর নিথর হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। রাশেদ তখনও ছিল, কিন্তু দাদু চলে যাওয়ার পরই আমরা প্রথম টের পেলাম-এই যুদ্ধ কোনো নিয়ম মানে না, বয়স চেনে না, কাউকেই রেহাই দেয় না। দাদু ঠিকমতো উঠে দাঁড়াতে না পারলেও প্রতিদিন বিকেলে উঠানের সেই হাতল-ভাঙা পুরোনো ইজি চেয়ারটায় বসে থাকতেন। তাঁর ঝাপসা চোখজোড়া থাকত বাঁশঝাড়ের ওপারে দিগন্তের দিকে। আনমনে বিড়বিড় করতেন-"বুঝলি খোকা,বাতাসের গন্ধ শুঁকে খবর বুঝতে হয়, পোড়া গন্ধ পাইতাছি...।" তখন আমি আর রাশেদ শুধু শুনতাম। কথাগুলো রাশেদ হয়ত কিছুটা বুঝত কিন্তু একাত্তরের 'সেই গুমোট বাতাসে সেই লাশের আর বারুদের গন্ধ মিশে ছিল সেটা বোঝার বয়স তখনও আমার হয়নি। আমাদের গ্রামটা ছিল ছবির মতো। বিলের ধারে সার সার হিজল গাছ আর ধানক্ষেত। যুদ্ধের সময় সেই বিলের পানিও যেন ভয়ে স্থবির হয়ে গিয়েছিল, ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনলেও মনে হতো কেউ যেন সংকেত দিচ্ছে। একদিন সকালে খুব কাছ থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। এতো কাছে যে জানালার কাঠগুলো পর্যন্ত কঠক করে কেঁপে উঠেছিল। দাদু বোধহয় ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। আমরা ধরতে পারিনি-ভয়ে,না-কি সময়ের অভাবে, জানি না। বিকেলের আগেই দাদুর শরীরটা ঠান্ডা হয়ে এল। কেউ এসে ওনাকে গুলি করেনি; বাইরের ওই বিভৎস শব্দটাই দাদুর হার্টবিট থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। দাদুর কবর আমরা সেইদিন দিতে পারিনি। বাইরে তখন শাঁ শাঁ করে আর্মি জিপ যাচ্ছে। রাত নামা মানেই অবধারিত মৃত্যু । কয়েক দিন পর,খুব ভোরে যখন দাদুর মাটি হলো,তখন জানাজাও

হয়েছিল ফিসফিস করে। মা কাঁদেননি,শুধু পাথর হয়ে বসে ছিলেন। বাবা মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন নির্নিমেষ, যেন এক পলক চোখ তুললেই বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়বেন। 'দাদু চলে যাওয়ার পর আমাদের ঘরটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা আর বিশাল হয়ে গেল। এরপর থেকেই সন্ধ্যার পর আমরা আর আলো সজ্বালাতাম না। বিদ্যুৎ ছিল, ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু আলো জ্বাললেই মনে হতো ঘরের ওই শূন্য জায়গাগুলো যেন আরও বেশি অশুভ হয়ে আমাদের গিলতে আসছে। আমাদের পরিবারটা ছিল খুব ছাপোষা। বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক যুদ্ধ শুরুর পর স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও বাবার কাজ থামেনি। তিনি এখন আমাদের প্রতিদিন নতুন পাঠ দিতেন-কীভাবে নিঃশ্বাস চেপে থাকতে হয়, কোন শব্ লুকিয়ে পড়তে হয় আর কোন নীরবতা মানেই বিপদ। মা ভাত রাঁধতেন মেপে মেপে। মাটির হাঁড়িতে চাল দেওয়ার আগে হাত দিয়ে দানা গুনতেন। এক মুঠো চাল মানে একেকটি পরমায়ু। মা বলতেন- "হিসাব কইরা খাইস বাপ, কাইল যে কী হইবো আল্লাই জানে।" আমি দেখতাম চাল ধোয়ার সময় মায়ের আঙুলগুলো কাঁপছে, তবু হিসাব কখনো ভুল হতো না। রাতে সামান্য শব্দ হলেই বুক কেঁপে উঠত-ভারী বুটের আওয়াজ, ট্রাকের

গর্জন, মাঝেমাঝে দূর থেকে ভেসে আসা আর্তচিৎকার। পাশের বাড়ির চেনা মুখগুলো একেএকে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল। সকালে যাকে দেখেছি, বিকেলে তার চিহ্ন নেই। আমরা প্রশ্ন করতাম না। যুদ্ধের সময় প্রশ্ন করলে উত্তর আসে না, শুধু শোকের পাল্লা ভারী হয়। রাশেদ তখন চৌদ্দ বছরের কিশোর। ভয়-ডর ওকে ছুঁতে পারত না। দাদুর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একদিন ও হুট করে বলে বসলো, "এইভাবে গর্তে ঢুইকা থাকা আমার সহ্য হয় না বাজান।
এমনে বাইচ্চা থাকা যায় না।" ওর কণ্ঠে কষ্ট থেকেও বেশি ছিল ক্ষোভ। মা শুধু অপলক ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাবা অনেকক্ষণ চুপ থেকে শুধু একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বললেন, "সাবধানে থাকতে হইবো বাপ।" এই সামান্য কয়েকটা শব্দের ভেতরেই বাবা বোধহয় তাঁর সারা জীবনের ভয় আর প্রার্থনা লুকিয়ে রেখেছিলেন। এক সকালে রাশেদ সেদিন হাসতে হাসতে বেরোবার আগে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল-"বুঝলি ছোট,এইবার দেশের জন্য কিসু করুন লাগবো। শরিফ ভাইরে কইয়া খবরের কামডা 'নিসি, বাজানরে কইস না। আমি যামু আর আমু।" যাওয়ার সময় দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "মা, ভাত ঢাইকা রাইখো, আমি আইতাসি" ওর হাসিটা ছিল খুব সাধারণ, ঠিক যেমন মানুষ শেষবার হাসলে দেয়। ও আর ফেরেনি। প্রথম দিন ভেবেছিলাম আসবে, দ্বিতীয় দিনও পথ চেয়ে ছিলাম। এরপর দিন গোনা বন্ধ হয়ে গেল; অপেক্ষাই হয়ে গেল আমাদের জীবনের ধ্রুবক। নয়টা মাস এভাবেই কেটে গেল। আমরা দিন নয়, শুধু রাত গুনতাম। অন্ধকারেই নিজেদের লুকিয়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। ডিসেম্বরের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে বাবা হঠাৎ রেডিওটা চালিয়ে দিলেন। অনেক দিন পর ঘরে এত জোরে শব্দ হলো। রেডিওর ভেতর থেকে একটা ভাঙা কণ্ঠ ভেসে এল- "দেশ আজ স্বাধীন!" আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাইরে দৌড়ে গেলাম। পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে মানুষের ঢল- কেউ হাহাকার করে কাঁদছে, কেউ পাগলের মতো 'হাসছে। লাল-সবুজ পতাকাগুলো ডিসেম্বরের বাতাসে উড়ছে। আকাশটা সেদিন অন্যরকম ছিল, একদম মুক্ত। মনে হচ্ছিল, সব কষ্টের বুঝি ইতি ঘটল আজ।
ঘরে ফিরে দেখি মা চুপচাপ বসে আছেন। কোলে রাশেদের সেই পুরোনো শার্ট, পাশে দাদুর 'লাঠি। আমি চিৎকার করে বললাম, "মা, দেশ স্বাধীন হইছে! শোনো মা!" মা মাথা তুললেন। চোখে অঝোরে জল পড়ছে, কিন্তু মুখে কোনো উল্লাস নেই। তিনি শুধু ফিসফিস করে বললেন, "দেশ তো স্বাধীন হইলো রে খোকা, কিন্তু আমার সোনার ঘর তো আধাখান হইয়া গেল।" সেদিন রাতে নয় মাস পর প্রথমবারের মতো আলো জ্বালানো হয়েছিল। ঘরটা নতুন করে দেখা গেল ঠিকই, কিন্তু নতুন কিছু যোগ হলো না। শুধু অনুপস্থিতিগুলো প্রদীপের আলোয় আরও প্রকট হয়ে উঠল। দাদু নেই, রাশেদ নেই। বাইরে যখন মানুষের জয়ধ্বনি চলছিল, ঘরের ভেতরে আমরা তিনটে মানুষ তখন পাথরের মতো নীরব। আমি সেদিন বুঝেছিলাম-স্বাধীনতা মানে শুধু শৃঙ্খল ভাঙা নয়। স্বাধীনতা মানে সেই শূন্যতাকে সারাজীবনের জন্য বয়ে নেওয়া, যা কারো কারো জীবনে আর কোনোদিন পূর্ণ হয় না।

স্বাধীনতার এতো বছর পরেও, যখন প্রতিবছর ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ আসে, আমি আমাদের বারান্দায় পতাকা ওড়াই। পতাকার লাল বৃত্তটার দিকে তাকালে আমার মনে হয়-ওটা বোধহয় কোনো রং নয়, ওটা রাশেদের সেই শেষ বিকেলের হাসি আর দাদুর সেই থেমে যাওয়া হৃদপিণ্ডের রক্ত। মা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে রাশেদের থালাটা একবার ছুঁয়ে দেখতেন। বাবা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বারান্দায় গিয়ে বসতেন, যেন অন্ধকার চিরে কেউ একজন এসে বলবে-"আইসা পড়ছি মা, ভাত বাড়ো।" আমাদের সেই অর্ধেক ঘরটা আর কোনোদিন পূর্ণ হয়নি। মানচিত্র পূর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছু ঘরের ইতিহাস চিরকাল ওই শূন্যতার গল্পই লিখে যাবে।